Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 246–251
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চক : চেনা মুখ, অচেনা ভাবনা

উজ্জ্বল মিশ্র
সহ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ
কিশোরনগর শচীন্দ্র শিক্ষাসদন, কাঁথি
ইমেল : ujjwalmishraa1947@gmail.com

Keyword
অচলায়তন, পঞ্চক, শোণপাংশু, দাদাঠাকুর, আচার্য, দর্ভক, ইংরেজ, স্থবিরপত্তন, মহাপঞ্চক, রবীন্দ্রনাথ।

Abstract
কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত রূপক সাংকেতিক নাটক 'অচলায়তন'। নাটকটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে আমরা দেখব এতে দুটি প্রধান ভাব রয়েছে। একটি বাহ্যিক, অপরটি আভ্যন্তরীণ। প্রথমটিতে দেখা যাবে প্রথা-প্রাণের দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণের জয়গান, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাস চেতনা। এই ইতিহাস চেতনার কথা নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, সমালোচক সুকুমার সেন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ বিশীও স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় ভাবনা অনুযায়ী নাটকের প্রধান দুই চরিত্র দুই ভাই পঞ্চক ও মহাপঞ্চক দুই বিপরীত ভাবনার অধিকারী। ইতিহাসগত দিক থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষ যদি প্রাচীন অচলায়তন হয়, তাহলে শোণপাংশুর দল হলো ইংরেজ দল, আর দর্ভকেরা ভারতবর্ষের পতিত অনার্য সম্প্রদায়। এই যুক্তিতে মহাপঞ্চক দেশের সেই ব্যক্তি, যে 'স্বধর্ম নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৩য় অধ্যায়, কর্মযোগঃ, শ্লোক-৩৫) এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে আয়তনরূপী ভারতবর্ষকে শোণপাংশুর দলের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। অপরদিকে তার ছোটভাই পঞ্চক গোপনে শোণপাংশুর দল ও তাদের প্রধান দাদাঠাকুরের সাথে গোপন যোগাযোগ রেখে আয়তনকে ক্রমে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে চেয়েছে। এই পরিণতি একদিক থেকে প্রাচীন প্রথা, রীতি-নীতি, কুসংস্কাররের পতন মনে হলেও ইতিহাসগত দিক থেকে এটি বিদেশি শক্তির কাছে কোনো কিছুর বিনিময়ে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করা। তাই দ্বিতীয় ভাবনা অনুযায়ী চেনা পঞ্চক আমাদের কাছে অনেকটাই অচেনা হয়ে যায়। নাট্যকাহিনির প্রায় প্রতি দৃশ্যে সে প্রমান রয়েছে। সার্বিক আলোচনায় আমাদের এ ভাবনার যথার্থ প্রতিফলন পরিলক্ষিত হবে।

Discussion
পঞ্চাশ বছর বয়সী কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব শান্তিনিকেতনে সাড়ম্বরে পালিত হওয়ার পর তিনি শিলাইদহে গিয়ে কিছুকাল থাকেন। এখানে বসবাস কালে তিনি যে নাট্য রচনায় হাত দেন, তার নাম 'অচলায়তন' (১৫ই আষাঢ়, ১৩১৮)। এই সময়পর্ব রবীন্দ্র জীবনের 'অধ্যাত্ম পর্ব' নামে পরিচিত। নাটকটি ১৩১৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পূর্ণ

মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথা ও প্রাণের দ্বন্দ্বই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু নাটকে উক্ত বিষয়বস্তু ছাড়াও একটি অন্যভাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন বলেছেন –

> "অচলায়তনে কাহিনী ও রূপক অবিচ্ছেদ্য। ইতিহাসে কোন ঘটনার ও ব্যক্তির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ কোন পুরাণ কাহিনী অথবা প্রাচীন-আধুনিক কোন গল্প অবলম্বনে নাটক কাহিনী পরিকল্পিত নয়। তবুও অচলায়তনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ভারতবর্ষের মৌলিক ইতিহাসের যে কোন বিশেষজ্ঞের রচনার তুলনায় কিছু কম নয়। একথা বলিলে ইতিহাসের পণ্ডিতেরা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, কিন্তু অসত্য ভাষণ হইবে না। অব্যবহিত পরবর্তীকালের রচনা– 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটি অচলায়তনের পূর্বাংশ অথবা উপক্রমণিকা রূপে গ্রহণীয়।"[১]

সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন -

> "...নাটকের বিষয়বস্তু ছাড়াও কবিমনের পশ্চাদভাগের একটি ধারণা বা চিন্তা নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা কবির ইতিহাস-চেতনা বা সমাজসমস্যা-চেতনার রূপ।"[২]

সমালোচক প্রমথনাথ বিশীও তাঁর 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ' গ্রন্থে উক্ত ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র (ষষ্ঠ খণ্ড) 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে যে আলোচনা রয়েছে, তা আমাদের আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

> "অধ্যাপক এডওয়ার্ড টমসন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে অচলায়তনে কোনো কোনো ইংরেজি গ্রন্থের ছায়া আছে, এইরূপ উক্তি করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি চিঠিতে (৩ আষাঢ়, ১৩৩৪) রবীন্দ্রনাথ এর সম্বন্ধে লেখেন – 'Castle of Indolence এবং Faerie Queen আমি পড়িনি- Princess-এর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠ-মন্দিরের অভাব নেই – আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাদেরই মিল আছে'।"[৩]

কবিগুরুর এমন বক্তব্যের সমর্থনে আমরা নাটকের কাহিনিবস্তুকে কবির ইতিহাস চেতনা বা সমাজসমস্যা চেতনার রূপ হিসেবে দেখতে পারি।

আমাদের এই প্রাচীন ভারতবর্ষ হলো প্রাচীন অচলায়তন। আদি গুরু অর্থাৎ প্রাচীন মুনি-ঋষিরা এ ভারতবর্ষকে তপোবন রূপে নির্মাণ করে অন্তর্হিত হয়েছেন। সেই তপোবনে তখন কেবল শান্তরস বিরাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে কবিগুরুর 'তপোবন' প্রবন্ধের একটি উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য –

> "এখানে সূর্য-অগ্নি বায়ু-জল স্থল-আকাশ তরুলতা মৃগপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।"[৪]

এরপর সেই আর্য ঋষিদের অবর্তমানে আয়তনের দায়িত্ব সামলেছেন পুরোহিতগণ। কিন্তু তাঁদের অজ্ঞতা হেতু এই 'তপোবন' ভারতবর্ষ ক্রমে অচলায়তনে পরিণত হয়েছে। এরপর দুর্বার গতিতে এই অচলায়তনরূপী ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে শক, হুন, পাঠান, মোগল, সবশেষে ইংরেজ। এরাই এক অর্থে নাটকের শোণপাংশুর দল। আমরা আরও সূক্ষ্ম ভাবনায় নাটকের স্বার্থে এই শোণপাংশুর দলকে শুধুমাত্র ইংরেজ দল বলতে পারি। ড. সুকুমার সেনও সেকথা বলেছেন–

> " 'শোণপাংশু' আক্ষরিক অর্থে- যাহারা লাল মাটি মাখে। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সে কথা ভাবিয়া লিখেন নাই। অথচ দুর্দান্ত বুনোদের 'শোণপাংশু' নাম অত্যন্ত সার্থক হইয়াছে। শোণপাংশুদের অচলায়তন আক্রমণের মধ্যে আমাদের দেশে ইউরোপীয় শক্তির প্রথম সংঘর্ষের ব্যঞ্জনা আছে। সেই দিক দিয়াও শোণপাংশু (= লালমুখ, গোরা) নাম সার্থক।"[৫]

নাটকেও সে ইঙ্গিত রয়েছে। 'অচলায়তন' নাটকের রচনাকাল ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ। ব্রিটিশদের রাজত্বকাল। তখন ভারতের রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় ছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ বা চার্লস হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬)। তাহলে আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই একটি সংশয় মিশ্রিত প্রশ্ন জাগে, তিনি ইংরেজ প্রতিনিধি 'দাদাঠাকুর' নন তো?

নাটকের কাহিনি সূত্র অনুযায়ী তৃতীয় দৃশ্যে স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্ত একটি দুঃসংবাদ দেন –

> "প্রত্যন্ত দেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে আরম্ভ করেছে।"[৬]

আমাদের রাজ্যসীমার কাছে অবস্থান করে প্রাচীর ভাঙতে শুরু করা ইংরেজদের চন্দননগর উপকূলে বণিকের ছদ্মবেশে এসে বাসা বাঁধার সমতুল। দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রায় শেষাংশে দাদাঠাকুরের মন্তব্য –

"আমাদের রাজার আদেশ আছে – ওদের পাপ যখন
প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে
উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।"[৭]

'আমাদের রাজা'? এই রাজা কে? দাদাঠাকুর যদি চার্লস হার্ডিঞ্জ হন, তাহলে এই 'রাজা' ইংল্যান্ডের শাসক পঞ্চম জর্জ (১৯১০-১৯৩৬) নন তো! যাঁর নির্দেশ এমন ভয়ংকর ছিল? আবার পঞ্চম দৃশ্যে শত্রুসৈন্যদের যে রক্ত বর্ণ টুপির কথা বলা হয়েছে, এ তো ইংরেজ সেপাইদের টুপির বর্ণ। শোণপাংশুদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সমীকরণ তাই কাল্পনিক নয়। তাহলে তো এই সিদ্ধান্তে আসা যেতেই পারে যে দাদাঠাকুরের দল- চতুর ইংরেজ বাহিনী!

তাহলে দর্ভক কারা? সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন –

"দর্ভকেরা আমাদের দেশীয় অনার্য তথাকথিত নিম্নশ্রেণী
– শবর, পুলিন্দ, ব্যাধ, কোল, ভীল ইত্যাদি।"[৮]

এঁরা ব্রাহ্মণ্য সমাজ দ্বারা চিরকাল পদদলিত, অস্পৃশ্য, অচ্ছুত বলে খ্যাত, অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কোল বিদ্রোহ, ভীল বিদ্রোহ, মুন্ডা বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ তার প্রমাণ। আলোচ্য নাটকেও এঁরা অচলায়তনে আসা শোণপাংশু দলের (ইংরেজ) সাথে বারবার যুদ্ধ করতে চেয়েছে। তাঁদের বাসস্থানও নির্দেশিত হয়েছে অচলায়তনের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পাড়ায়। রাজা মন্থরগুপ্ত আচার্য অদীনপুন্যকে নির্বাসিত করবার সময় বলেছেন –

"আয়তনের বাহিরে নয়... আমার পরামর্শ এই যে,
আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকদের পাড়া আছে এ-কয়দিন
সেখানেই তাঁকে বন্ধ করে রেখো।"[৯]

আর পঞ্চক-মহাপঞ্চক? নাটকের কাহিনি অনুযায়ী এরা দুই ভাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের একটি কাহিনি থেকে এই দুটি নাম রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। একজন চরম কুসংস্কার বিরোধী, অপরজন চরম কুসংস্কারাচ্ছন্ন; একজন প্রাণের জন্য লড়াই করেছে, অপরজন প্রাচীন প্রথা রক্ষার জন্য লড়াই করেছে; একজন দেশবিরোধী, অপরজন দেশপ্রেমিক।

পঞ্চককে 'দেশবিরোধী' অভিধায় ভূষিত করার ভাবনা কষ্টকল্পিত হতে পারে কিন্তু নাট্যকাহিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি ইতিহাস চেতনায় আলোচিত হয়, তবে নাট্যসূত্র যেন তারই প্রমান দেয়। পঞ্চক যেন ইংরেজ রাজত্বকালে সেই ভারতীয় সন্তান, যারা বিবিধ স্বার্থের কারণে, কখনো সিংহাসনের লোভে ইংরেজদের চর হিসেবে কাজ করত। নাটকের প্রথম দৃশ্যে আমরা জানতে পারি পঞ্চক লুকিয়ে লুকিয়ে শোনপাংশুদের সাথে দেখা করে।

"আচার্য । তুমি কী কর না-কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে,
কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের
বাইরে গিয়ে শোণপাংশু জাতির সঙ্গে মেশ ?
পঞ্চক । আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান ?
আচার্য । না না, থাক্ বোলো না । কিন্তু শোনপাংশুরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ।
তাদের সহবাস কি - "[১০]

আচার্যের এমন প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর পঞ্চক না দিলেও কথোপকথন হতে আমরা বুঝতে পারি পঞ্চক লুকিয়ে শোনপাংশুর দল অর্থাৎ ইংরেজ দলের সাথে গোপন বৈঠক করে অথচ দ্বিতীয় দৃশ্যের সূচনায় পঞ্চকের কণ্ঠে যে গান রয়েছে, তাতে পাঠকের মনে হবে পঞ্চক যেন শোণপাংশু পাড়ায় যাওয়ার পথ জানে না। -

"এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে-
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক- পানে-

তা কে জানে তা কে জানে।"[১১]

নাটকের পূর্বসূত্রে আমরা খবর পেয়েছি, পঞ্চক লুকিয়ে লুকিয়ে শোণপাংশুদের সাথে সাক্ষাৎ করত। সে পথ কি অন্য কোনো পথ ? পঞ্চক তবে কি অন্য কোনো গোপন পথ দিয়ে গিয়ে শোণপাংশুদের সাথে দেখা করত? একবার নয়, একাধিক বার? অন্য কোনো পথ ছিল কি? নাকি পঞ্চক মিথ্যে অভিনয় করল, যেন সে শোণপাংশু পাড়ায় যাওয়ার পথ জানে না! যদি না-ই জানে, তাহলে শোনপাংশুর দল তার গানের তালে তালে নৃত্য করল কেন? যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই পঞ্চক তাদের অচেনা, তাহলে অচেনা একটি কিশোর হঠাৎ করে ঐ পাড়ায় কোথা থেকে এল, এ প্রশ্ন তাদের মনে জাগল না? আসলে আমাদের মনে হয় শোণপাংশুদের সাথে পঞ্চকের যোগাযোগ যথেষ্ট ভালোই ছিল, যা পঞ্চক গোপন করতে চেয়েছে।

শুধু শোণপাংশু কেন, তাদের নেতা দাদাঠাকুরের সাথেও পঞ্চকের গোপন যোগাযোগ ছিল। দ্বিতীয় দৃশ্যের একটি কথোপকথন তার প্রমান দেয়।

"দাদাঠাকুরের প্রবেশ
প্রথম শোণপাংশু । দাদাঠাকুর!
দাদাঠাকুর । কী রে?
দ্বিতীয় শোণপাংশু । দাদাঠাকুর!
দাদাঠাকুর । কী চাই রে?
তৃতীয় শোণপাংশু । কিছু চাই নে – একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।
পঞ্চক । দাদাঠাকুর !
দাদাঠাকুর । কী ভাই, পঞ্চক যে।"[১২]

পঞ্চক যেন শোণপাংশুদের মতো দাদাঠাকুরের চেনা চরিত্র। অচেনা হলে তো দাদাঠাকুরই হয়তো শোনপাংশুদের প্রশ্ন করতেন, ছেলেটি কে? বা কোথা থেকে এল এই অচেনা ছেলেটি? আবার যদি ধরে নেই পঞ্চকের সাথে দাদাঠাকুরের কখনো কোনো কারণে দেখা হয়েছিল, তাহলে এত স্পষ্টভাবে নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। সংলাপই বুঝিয়ে দেয় দাদাঠাকুর ও পঞ্চকের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

আবার শোণপাংশুরা একটু আড়াল হলে দাদাঠাকুরের সাথে পঞ্চকের কথোপকথন শুরু হয়। দাদাঠাকুরের পায়ের ধুলো নেয় পঞ্চক। দাদাঠাকুর যখন পঞ্চককে পায়ের ধুলো নেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন পঞ্চক তার কথায় যেন বুঝিয়ে দেয় যে, সে পদলেহন করতে ভালোবাসে-

"নিতে ইচ্ছে করে। বুকের ভিতরটা যখন ভরে ওঠে, তখন বুঝি তার ভারে মাথা নিচু হয়ে পড়ে – ভক্তি না করে বাঁচিনে"[১৩]

দাদাঠাকুরও যেন পঞ্চকের জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করতে চান। ছলে অচলায়তন থেকে বেরে করে আনার প্রতিশ্রুতি দেন। মিষ্ট কথায় পঞ্চকের মনটাকে যেন উতলা করে অচলায়তনের খবরাখবর জেনে নিতে চান। পঞ্চকও দাদাঠাকুরের ছলনা বুঝতে না পেরে আত্মসমর্পণ করে গান ধরে-

"যা হবার তা হবে।
... ...
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে।'[১৪]

লুকিয়ে যে সে ইংরেজ প্রতিনিধি দাদাঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ করে, তা আবারও প্রমাণিত হয় দ্বিতীয় দৃশ্যের একটি সংলাপে।

"দাদাঠাকুর, আমার অচলায়তন ছেড়ে অনেক সাহস করে তোমার কাছ অবধি এসেছি,'[১৫]

আয়তনের কোন ব্যক্তি এ ঘটনা জানেন কিনা, দাদাঠাকুর পঞ্চককে জিজ্ঞেস করলে পঞ্চক জানিয়ে দেয় যে, আচার্য নাকি বিষয়টা জানেন, তবে এ নিয়ে তাঁকে কোনদিন আচার্য প্রশ্ন করেন না। পঞ্চকের কথায় –

"আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে যাই তিনি আমাকে দেখেই বুঝতে পারেন।"[১৬]

পঞ্চক দাদাঠাকুরকে গোপন প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে আয়তনের প্রাজ্ঞ আচার্যকেও দাদাঠাকুরের সাথে মিলিয়ে দেবে এবং দাদাঠাকুরকে যেন পঞ্চক একপ্রকার জোরই করে, তিনি যেন অচলায়তন লণ্ডভণ্ড করে দেন –

> "ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে
> চাই।... মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায়
> তুমি জোর দাও – তুমি জোর দাও-'[১৭]

দাদাঠাকুর ও তার দলের সাথে পঞ্চকের শুধু দেখা করা কিংবা কথা বলাতেই যোগাযোগ নয়, একসাথে খাওয়া-দাওয়াও হয়, আর অচলায়তনরূপী ভারতবর্ষকে কিভাবে ধ্বংস করা যায়, তার পরিকল্পনা হয়। পঞ্চক যেন প্রমাণই করতে চেয়েছে বারবার যে সেও দাদাঠাকুরের দলেরই একজন। পঞ্চকের উপস্থিতিতে এরপর শোণপাংশুর দল দাদাঠাকুরকে খবর দেয় স্থবিরপত্তনের রাজা চণ্ডককে মেরে ফেলেছে। এতে দাদাঠাকুর যখন শোণপাংশুদের নিয়ে স্থবিরপত্তন আক্রমণের কথা বলেন, তাতে পঞ্চকও দাদাঠাকুরের দলের হয়ে স্থবিরপত্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছে। পঞ্চক কি জানত না, যে স্থবিরপত্তনেরই অন্তর্গত অচলায়তন!! স্থবিরপত্তন ধ্বংসের পাশাপাশি অচলায়তনও যে দাদাঠাকুর কর্তৃক ধ্বংস হচ্ছে, এ খবর হয়তো পঞ্চক গোপনে সংগ্রহ করেছিল, তাই তার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য –

> "মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায়
> যেন বর্ষা নেমেছে।"[১৮]

এ বর্ষণ রসের বর্ষণ, যার প্রয়োজন ছিল নীরস অচলায়তনে- এটা যেমন এক অর্থে সঠিক, তেমনি 'বর্ষা নেমেছে' কথাটি দাদাঠাকুরের দলের 'আক্রমণ চলছে' বোঝাতে চাওয়া হয়নি তো? পঞ্চক তার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে আচার্য ও উপাচার্যকে তার দলে টেনে নিয়েছে। চতুর দাদাঠাকুরের কাছে এও হয়তো ছিল পঞ্চকের গোপন প্রতিশ্রুতি। চতুর্থ দৃশ্যের শেষাংশেও পঞ্চক ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছে –

> "আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল ! শুনছ আচার্যদেব,
> বজ্রের পর বজ্র! আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ
> করে দিলে যে!"[১৯]

এ তো একেবারে স্পষ্ট, বজ্রের আঘাত আসলে আয়তনের উপর আঘাত, যা পঞ্চকের অজানা ছিল না।

পঞ্চম দৃশ্যে মহাপঞ্চক নিজেকে 'আচার্য' হিসেবে পরিচিত করিয়ে যখন দাদাঠাকুরকেই আয়তন থেকে শোনপাংশু দল সহ বেরিয়ে যেতে বলে, তখন দাদাঠাকুরের উক্তি –

> "আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য;
> আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।"[২০]

তাহলে দাদাঠাকুরের আদেশই শেষকথা। দাদাঠাকুর যদি বহিঃশক্তির প্রতিনিধি হন, তাহলে ভারতবর্ষীয়দের উপর এ একপ্রকার দাদাগিরি নয় কি? যা পরাধীন ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি ভারতীয়কে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। আবার এই একই দৃশ্যেই প্রথম শোণপাংশু মহাপঞ্চককে বন্দি করে তাদের দেশে (ইংল্যান্ডে?) নিয়ে চলে যেতে চায়। মহাপঞ্চককে দেখে নাকি তাদের দেশের লোক মজা পাবে। আসলে ভারতীয়রা যে একসময় ইংরেজদের কাছে 'মজা'-র মানুষ ছিল, তা এই সংলাপে প্রমাণিত হয়।

শেষ দৃশ্যে এসে দেখা যায় পঞ্চকের খবর গোপন করার মানসিকতা, আচার্যের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় কাজ করছিল হয়তো। পঞ্চক জানে যে দাদাঠাকুরের দল অচলায়তনে গেছে সবকিছু ধ্বংস করতে, দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে পঞ্চকের উপস্থিতিতেই এ সংবাদ পাঠক পেয়েছেন, অথচ প্রথম দর্ভক যখন বলে যে অচলায়তনে যারা লড়াই করতে গেছে, তারা 'দাদাঠাকুরের দল', তখন পঞ্চক ছলনা করে বলে –

> "দাদাঠাকুরের দল ! বল্ বল্ শুনি, ঠিক
> বলছিস তো রে?"[২১]

দ্বিতীয় দর্ভক এ প্রশ্নের উত্তর সদর্থক দিলে পঞ্চক খুশি হয়ে যায়। পঞ্চকের খুশির কারণ কী? তাহলে কি আমরা ধরে নেবো পঞ্চক মনে মনে চেয়েছিল দাদাঠাকুররূপী ইংরেজ দল অচলায়তন ভারতবর্ষকে অধিকার করুক। এ কি দেশ বিরোধী

ভাবনা নয়? এমনকি আচার্য যখন পঞ্চককে জিজ্ঞেস করেন যে পঞ্চক 'দাদাঠাকুর' বলে কাকে সম্বোধন করছে? এতে পঞ্চক জানায়-

"আচার্যদেব, ঐটে আমার গোপন কথা"[২২]

এরপরেই সে মিথ্যে ছলনা করে বলে যে সে দর্ভকদের সাথে অচলায়তনে গিয়ে দাদাঠাকুরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। সত্যিই লড়াই করত কি? কার সাথে লড়াই করত সে? যিনি তাকে অচলায়তনের দায়িত্ব দেন, তার বিরুদ্ধে? হাস্যকর ভাবনা নয় কি? নাটকের শেষে পঞ্চক হয়ে যায় 'নতুন আচার্য'। তাহলে তো ধরেই নেওয়া যায় যুগে যুগে কালে কালে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, পঞ্চক তো গোপনে মহাপঞ্চকের বিরুদ্ধে ছুরিতে শান দিয়ে 'আচার্য' পদে অভিষিক্ত হয়ে সে কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছে!

তথ্যসূত্র :

১. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), ইস্টার্ন পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৭৬, পৃ. ২৮৬
২. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পরিমার্জিত সপ্তম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৪১৯, পৃ. ২৪৭
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২৬, পৃ. ৭৮৬
৪. তদেব, (সপ্তম খণ্ড), পৃ. ৬৯৬
৫. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড), ইস্টার্ন পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৭৬, পৃ. ২৮৯
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২৬, পৃ. ৩৩৪
৭. তদেব, (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃ. ৩৩০
৮. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পরিমার্জিত সপ্তম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪১৯, পৃ. ২৪৭
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২৬, পৃ. ৩৩৫
১০. তদেব, পৃ. ৩১৬
১১. তদেব, পৃ. ৩১৮
১২. তদেব, পৃ. ৩২৩
১৩. তদেব, পৃ. ৩২৪
১৪. তদেব, পৃ. ৩২৫
১৫. তদেব, পৃ. ৩২৬
১৬. তদেব, পৃ. ৩২৬
১৭. তদেব, পৃ. ৩২৬
১৮. তদেব, পৃ. ৩৩৭
১৯. তদেব, পৃ. ৩৩৯
২০. তদেব, পৃ. ৩৪৪
২১. তদেব, পৃ. ৩৪৬
২২. তদেব, পৃ. ৩৪৭